প্রাগৈতিহাসিক কেচ্ছা-৯

(মেজর, মাখন, মজু নামের বালকেরা আজ হতে ষাট বছর আগে গাজীপুরের এক গন্ডগ্রামে বনে বাদারে ঘুরে বেড়াত। সে ছিল এক প্রাগৈতিহাসিক কাল। সমাজে মানুষের পাশাপাশি জ্বিন-পরীদেরও অবাধ বিচরণ ছিল। জঙ্গলে বাঘ ছিল, হরিণ ছিল। আর ছিল ডোবা-নালা-বিল-হাওড়ভর্তি অজস্র মাছ। প্রাগৈতিহাসিক সেই সমাজ নগর-সভ্যতার অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে বহুকাল আগে; তবুও হারিয়ে যাওয়া সেই সময় এখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে যায় মনের আকাশে। সেইসব প্রকৃতি-বালকদের রোজনামচার কিছু অংশ স্মৃতিবদ্ধ করার প্রয়াসেই অত্র উপাখ্যানগুলির অবতারণা।)

উঁশি ও লালমিয়া সমাচার

লাল মিয়া বলল--'তুই যা, আর কক্খনও আমার কাছে আসবি না । তুই তর উষারাণীরে লইয়া থাক্, আমাগো কথা ভুইলা যা' ।

লাল মিয়া আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, জানের জানও বলা যায় । আমার জন্যে সে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছে। ওদের আইলের পাড়ের আমগাছটিতে এতদঞ্চলের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আম ফলে। গিলা গিলা আমগুলি মধুর মতো মিষ্টি, ভেতরের আঁটি পোলাপানের জিবলার মতো পাতলা । বেহেশতের বাগানে যে আম দেয়া হবে সেগুলি হুবহু আইলের পাড়ের আমের অনুরূপ হবে বলে আমাদের সকলের বিশ্বাস । গাঁয়ের ছেলেরা আইলের ধারে কাছে ভিড়তে পারে না, অথচ লালমিয়ার কল্যানে আমার সেখানে অবাধ গতি । শুধু কি তাই ? লালমিয়ার বাপ নেলন্দি মোক্তার প্রতি বছর আশ্বিন মাসে দুইদুইটা বজরা বোঝাই করে লোক-লশকর নিয়ে মীরপুরের দরগায় যায় । সাথে যায় চারপাঁচটা মোটাতাজা খাসি ও অসংখ্য কুকরো । এই উপলক্ষে লালমিয়াদের বাড়ীতে মেলা বসে, সারারাত মারফতি-মুরশিদী গান চলে । তারপর আশেপাশের আটদশটা গায়ের লোকের চোখের উপর দিয়ে নিশান উড়িয়ে বজরাগুলি সুদূর মীরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় । সে এক এলাহি কারবার । লালমিয়া আমার সাথে করাল করেছে, এবার সে আমাকে নিবেই । প্রতিদানে বলতে গেলে আমি ওকে কিছুই দিতে পারি না । আমি ওর সাথে মিশি কেবল এজন্যেই সে ধন্য হয়ে আছে । এহেন নিঃস্বার্থ বন্ধু কী কারনে এত বিরূপ হয়ে যায় তার পেছনেও যে সেই 'ইটার্নাল ট্রায়াঙ্গাল' কার্যকরী ছোটবেলায় তা বুঝে উঠা সহজে সম্ভব হয়ে উঠে না ।

বাড়ীতে খেকশিয়ালের ভীষন উপদ্রব হয়েছে । একটা পাটকিলে রংয়ের শিয়াল বড় বেশী জ্বালাচ্ছে, দিনে দুপুরে বাড়ীতে চড়াও হয়ে মুরগীর ঘাড় কামড়ে ধরে নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে যায় । পিছু ধাওয়া করলে লেজের ডগাটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না - এমন ধড়িবাজ । বেজীদের সাথে যদি শিয়ালরাও জোট বাঁধে তা'হলে গেরস্থ বাঁচে কীভাবে ? গাশ্শির রাতে জবাই দেবে এই নিয়ত করে মা একটা লাল রংয়ের মোরগ পালছিলেন, চিত্রবিচিত্র ঝুঁটি উঁচিয়ে তা মুরগী সুন্দরীদের রাজ্যে এতদিন মহাসুখে রাজত্ব করে যাচ্ছিল । কাল দুপুরে আচমকা পাটকিলে এসে তাকে ঝুঁটিতে ধরে নিয়ে গেছে । আমরা এতগুলি পোলাপান হৈ হৈ করে পিছু ধাঁওয়া করেও পাটকিলের লেজের দেখা পাই নাই । ছিটকি আর ভেন্না বনের অথৈ জংগলে তার খোজ প্রায় অসম্ভব কার্য্য । পাটকিলেকে রক্ষা করার জন্যে ভেন্না গাছের পাতায় পাতায় অজস্র ছেংগা রোয়া উঁচিয়ে আছে । শরীরে তার একবিন্দু ছোয়া লাগলে পঁচা ঘা হয়ে যাবে ।

মাখনা বললো--'লাঠি-মাঠিতে কাম অইবো না, কুত্তা পোষ্ । কুত্তা ছাড়া হিয়ালেরে টাইট্ দেওন যাইবো না'।

এমন সময় দেখা গেল অনেক লোক পশ্চিম পাড়ার দিকে দৌড়ে যাচেছ । মজু-হবি দুই ভাইকেও ছুটতে দেখা গেল ।

আমি চিৎকার করে বললাম--'এ্যাই মজু, কী অইছে রে, যাস্ কই'?

উড়ন্ত মজুর পায়ের গোড়ালি হতে উত্তর ভেসে আসে-- 'কাশিমালির বাড়ীত্ । দারগালির চউক্ কানা অইয়া গেছে গা' ।

এ্যাঃ, কয় কি ! দারগালি কানা অইয়া গেছে, কেমনে অইল ?

নিমেষের মধ্যে আমাদের শরীরেও গতি এসে গেল, প্রাণপনে কাশিমালির বাড়ীর দিকে ছুটছি ।

কাশিমালির বাড়ী লোকে লোকারণ্য । দুর হতেই দারগালির মা'র উচ্চকণ্ঠ কান্নার ছড়া আমাদের শ্রবনযন্ত্রকে পরিপুর্ন করে দিল--'অরে বাবারে, এ আমার কী আইল রে । আমার বাবার চউক নাই রে, আমার কপাল পুড়ল রে...'।
ছন্দায়িত সেই শোকগাথা শুধু মুখেই উচ্চারন করছে না দারগালির মা, মাঝে মাঝে বুকে ও কপালে হাত দিয়ে চটাৎ চটাৎ করে সজোরে আঘাত করছে ।
এই কান্নায় মানুষ মরার সুর, দারগালি কি তা'হলে মরে গেছে !
লোকেদের গা গলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম । দারগালি মরে নাই, তবে বারান্দায় মরার মতো পড়ে আছে । তার ডান চোখটি বেরিয়ে এসেছে; গাল, মুখ ও বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে । বেরিয়ে আসা চোখের দিকে চোখ পড়তেই আমার গা গুলিয়ে উঠল, এমন বীভৎস্য দৃশ্য জীবনেও দেখি নাই ।
সতীর্থদের কাছে পুরো রিপোর্ট পাওয়া গেল । কাশিমালির প্রধান শখ পাখি শিকার । বিরাট একটা "জাউঠা" বক ধরে সে উঠানে পলো দিয়ে বন্দী করে রেখেছিল । দারগালি খুশীমনে পলোর কাছে চোখ নিয়ে পাখীটাকে খোঁচা মারছিল আর ছড়া কাটছিল--

'কানা বগী না সোনা বগী
কানা বগী না সোনা বগী'

এটা এমন কোন বিষয় না। ফাঁদ দিয়ে বক ধরে এ রকম সবাই করে, আমরাও বিস্তর করেছি । দারগালির কপাল খারাপ, হঠাৎ বকটা ঠুকুস্ করে দারগালির ডান চোখে ঠোকর বসিয়ে দিয়েছে । পলোর শলাগুলি বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছিল, চোখটা সে পুরোপুরি তুলে নিতে পারে নাই, বাইরে বেরিয়ে এসে তা এখন ঝুলছে । নাও বাবা, কে সোনা বগী আর কে কানা বগী তা ভালো করে বুঝে নাও ।

দারগালী দর্শন শেষ করে আমরা হৃষ্টমুখে ফিরছিলাম । হৃষ্টমুখে এইজন্যে যে এমন একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা রোজ রোজ ঘটে না, দেখার সৌভাগ্য তো দুরস্থান।
- 'এ্যাই মেজর, দারগালিরে দেখতে গেছিলি' ?
মিষ্টি কন্ঠের ডাক শুনে ফিরে তাকালাম।
উষা। আমার সহপাঠিনী উষারানী চক্রবর্তী বকুল গাছের নীচে দাড়িয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। হিন্দু-পাড়ার মেয়েগুলি এরকমই, সবসময় সেজেগুজে ফিটফাট থাকে। হাটু অবধি একটা গলাবন্ধ ফ্রক, দুইটা বেণী আঁকাবাঁকা হয়ে পিঠের উপর দুলছে। ঝা ঝা দুপুরের অকৃপন আলো বকুল গাছের ফাক-ফোকর গলে কালো চোখে নাঁচছে। এতদিন একসাথে পড়ছি, উষাকে এত সুন্দর লাগে নাই কোনদিন।
উষা বললো--'ইস্কুলে যাস্ না ক্যান ? প্যারিমোহন স্যার রোজ তর খোঁজ করে। তুই এবার বিত্তি পাবি স্যারেগো কতো আশা; সেই তুই এ্যাক হপ্তা ইস্কুলে যাস্ না। মফে কইল তুই নাকি আর পড়ালেখা করবি না, হালচাষ করবি, হাচা'?
-'আরে না, সব ভোগা কথা। আমাগো বাড়ীর রাখালডা জ্বরে পড়ছে, রোজ গরু লইয়া চকে যাইতে অয়। ইস্কুলে যামু কেমনে, ক'।
আমার কথায় খুব খুশী হয় উষা। আমার জন্যে এই শ্যামলা রংয়ের মেয়েটির বুকে এত দরদ জমা হয়ে আছে তা জানা ছিল না। বললো--'শব্রি খাবি ? আমাগো শব্রি গাছে মেলা শব্রি পাইকা আছে, যাবি'?
শশধর চক্রবর্তীর পেয়ারা বাগান দেশ-বিখ্যাত। গাছে ঝুলে থাকা পেয়ারাগুলিকে ডাসা দেখায়, অথচ ভেতরটা নরম ও লাল টুকটুকা। অপুর্ব স্বাদ। এলাকার লোভী বালকদের তীর্থস্থান সেই পেয়ারা বাগানে আমার সাদর নিমন্ত্রন ! বালক মহলে আমি যে কেউকেটা আজ তা প্রমানিত হলো।
লালমিয়া এতক্ষন আমার পেছনে মুখ গোঁজ করে দাড়িয়েছিল, এবার গা ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল--'কাম আছে, আমি যাই'।
আশ্চর্য হয়ে লালমিয়ার দিকে তাকাই। বোকা নাকি, এমন সুযোগ কেউ স্বেচ্ছায় ছাড়ে ? লালমিয়ার মুখে রাজ্যের গাম্ভীর্য্য। বললো--'তুই থাক, পাকা হব্রি খাইয়া আয়। আমার মেলা কাম--চললাম..'। বলেই হন হন করে চলে যায় লালমিয়া।

ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে আমার মনের আকাশে অভিমানের মেঘ ঘনিয়ে আসে। লালমিয়া এত নিষ্ঠুর, আমাকে ফেলে এভাবে চলে যেতে পারলো ! ওর জন্যে কী না করেছি আমি ? ওর সাথে সতীশের জিলা খেকে মাছ চুরি করেছি, শাম ব্যাপারির খেত থেকে মিছরিদানা কাটতে যেয়ে ধরা পড়ে মার খেয়েছি, আজগানার সিরাজ মিয়ার ভরা কলাই খেত গরু লাগিয়ে সাবাড় করেছি। এই সেদিনও লালমিয়া যখন ময়ফলির সাথে লটরপটর করতে যেয়ে নেলদ্দি মামুর হাতে বেধড়ক মার খেল- ওর সমব্যথী ও সাপোর্টার ছিলাম একমাত্র আমি। ওর জন্যে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এত পাপ করেছি যে দোজখ ছাড়া আমার আর কোন গতি নাই। অথচ সেই কিনা আজ আমাকে ফেলে চলে গেল!

উষা বললো--'ওরকম বাওটা পোলাপানের সাথে মিশছ্ ক্যান ক'তো ? এই বয়সেই তামুক খাইয়া ঠোট কালা কইরা ফেলছে, তুইও তামুক খাস্ নাকি'?

উষার কথায় ঘাবড়ে যাই আমি। পয়সা দিয়ে বিড়ি কেনার বিলাসিতা আমার সামর্থের বাইরে, তবে হুক্কা টানার সুযোগ পেলে ছেড়ে কথা কই না। আমার ঠোটও লালমিয়ার মতো কালো বরণ ধারন করেছে কিনা কে জানে ?

অসীম সাহসে বুক বেঁধে বললাম--'আরে না, তামুক খাইলে উপায় আছে ? বড় ভাই টের পাইলে ঠাইট মাইরা ফালাইব না..'।

উষা মুচকি হেসে বললো--'মিছা কথা কবি না। ইস্কুলে পলাইয়া পলাইয়া রফিকগো লগে বিড়ি টানস্, আমি দেখছি'।

সর্বনাশ! সাংঘাতিক চালাক মেয়ে তো !

বললাম--'হে তো দুই এ্যাকদিন শখ্ কইরা টান দিছি। বিশ্বাস কর্ উষা, আমি হাচাই বিড়ি তামুক খাই না'।

-'ঠিক আছে বিশ্বাস করলাম। তামুক খাইলে মুখে বদ্ গন্ধ অয় । আবার যুদি তরে পলাইয়া বিড়ি টানতে দেখি, হেড্ মাষ্টরের কাছে কইয়া দিমু'।

খুশি হয়ে বলি--'নো যাই, তরে হব্রি পাইড়া দেই'।

উষাদের বাড়ীটা বিরাট। অনেকগুলি টিনের ঘর, ইটের বেড়া । বাইরে বিশাল চৌচালা টিনের বাংলা ঘর। সব ঝক্ঝক্ তক্তক্ করছে, আমাদেন্ব বাড়ীর মতো চারিদিকে রাজ্যের জঞ্জাল জড়ো হয়ে নাই। আম-জাম-কাঠাল-বকুল প্রভৃতি হরেক রকম বনস্পতিতে ছায়াশীতল করে রেখেছে বাড়ীটি। গোয়াল ঘর অনেক দুরে, পুকুরের একপ্রান্তে। জবজবে সিঁদুর পরা এক স্বাস্থ্যবতী মহিলা গোয়ালের দিক হতে হেটে আসছেন।

আমাকে দেখে বললেন--'ইডা কে রে উশি'?

উষা বললো--'মা, অর নাম মেজবাহ্, আমার লগে পড়ে। আমাগো ক্লাশের ফার্ষ্ট বয়। পুব্ পাড়ার রাহে-ফখরের নাম শোন নাই, ও তাগো ছোট ভাই'।

-'অ, তুমি জেহার দাদার পোলা। বেশ বাবা, বেশ। তোমার বাবা কেমন আছে ? আগে তোমার বাবা কত আইত, বহুৎ দিন হয় দেখি না'।

-'বাবা অহন ঢাকায় থাকে, ছয় মাস ধইরা বাড়ীত আহে না'।

একটু হাসলেন মহিলা, তারপর বললেন- 'উশি, অরে জল-খাবার দিছস্ ? আস বাবা, ভিতরে আস। তোমারে কোনদিন দেখি নাই, তোমার বড় ভাই রাহে কমলের বন্ধু আছিল। কমল কইলকাতা চইলা যাওয়ার পর আর একদিনও আইল না'।

উষা বললো--'মা তুমি যাও, আমরা একটু পরে আসতাছি। অরে আমাগো বাগানডা ঘুরাইয়া দেখাইয়া আনি'।

উষার সাথে বাগানের দিকে হাটতে থাকি। কয়েক পাখি জায়গা জুড়ে হরেক রকম ফল ফলারির গাছ। ছোট ছোট পাখীদের চিক্ চিকারি ছাড়া চারদিক নিস্তব্দ, সুন্-সান্ । এই রকম একটা নিরিবিলিতে একজন অনাত্মীয়া মেয়ের সান্নিধ্যে আসার অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। এক অকারণ পুলকে মনটা চনমন করে উঠলো। আহ্ ! পাখীদের মতো পাখা থাকলে এ্যাকখুনি উষাকে নিয়ে আকাশে উড়াল দিতাম।

ছোট ছোট পেয়ারা গাছ। অনায়াসেই একরাশ কাঁচাপাকা পেয়ারা দিয়ে উষার কোল ভরে দিলাম। বললাম--'এই উষা, তর মায় তরে উশি কয় কেন রে ? উষা, উশি, খুশি, পুশি..। আমি তরে পুশি বইলা ডাকুম'।
উষা বললো--'এই মেজবাহ্, তর মায় তরে মেজর কয় কেন রে ? মেজবাহ্, মেজর, ক্যানিশ..। আমি তরে ক্যানিশ বইলা ডাকুম'।
সর্বনাশ! আমার শরমের নামটা এতদুর পর্য্যন্ত রটেছে ! ইচ্ছে করছিল পারুল বুজিরে কাঁচা খেয়ে ফেলি, সেই আমার এই হতচ্ছাড়া নামটির রটনাকারী।
আমি কাতর হয়ে বললাম- 'বেশ তো, ভালই তো। ক্যানিশ নাম খারাপ কী ? আইচ্ছা উশি, অই গাছ দুইটা কী গাছ রে, সোন্দর বাস্না আইতাছে'?
উষা বললো- 'ঐটা তেজপাতা গাছ, আর ঐটা দারুচিনি গাছ। বাবা দুর্গাপুর পিসির বাড়ী থেইকা আইনা লাগাইছে। আরও অনেক লাগাইছিল, সব মইরা গেছে, দুইটা মাত্র জিতছে'।
উষার কথা শুনে বড়ই আশ্চর্য্য হই, বুঝতে পারি ওরা আসলেই আরেক জগতের মানুষ। আলাদা জাতের। আমাদের বাড়ীতে পিটকাল গাছ, ভেন্না গাছ আর মাদার গাছ ছাড়া আর কোন্ গাছ আছে ? তেজপাতা, লবংগ, দারুচিনি--এসব কি মাটির পৃথিবীতে ফলে, এসব তো রূপকথার দেশের গাছ ? সিন্দবাদ নাবিকেরাই কেবল দারুচিনি দ্বীপে যেতে পারে। আমার ঘরের এত কাছে একটা দারুচিনি দ্বীপ আছে তা তো জানা ছিলো না !

একটা 'উহ্' শব্দ আমাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনে। চেয়ে দেখি উষা তার ডান পা চেপে ধরে বসে পড়েছে। মস্তো একটা বরই কাটা বিঁধে আছে তার পায়ে। পায়ের গোড়ালী উঁচু করে ধরা, ছোট্ট সুন্দর নরম তালুতে ডাটিওয়ালা একটি কুৎসিত কাঁটা নির্লজ্জভাবে বিঁধে আছে।
দৌড়ে কাছে যাই উষার, সযত্নে পা'টা দু'হাতে চেঁপে ধরে একটানে কাটাটা বের করে আনি। সরু ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বললাম- 'হাটবি না, চুপচাপ বইয়া থাক। আমি অষুধ লাগাইয়া দিতেছি'।
উষা হাসিমুখে বললো-'অষুধ পাবি কই'? আমি ধমকের সুরে বলি-'দুনিয়ায় অষুধের অভাব আছে নাকি? বিলে যখন মাছ ধরতে যাই শিং মাছে কাটা দিলে আমরা বিশকাটালি দিয়া বিষ নামাই। এখানে তো বিশকাটালি পাওয়া যাইব না--। খাড়া, ব্যবস্তা করতাছি'।
কিছু কচি দুব্বা ঘাস তুলে দাত দিয়ে ভালোভাবে পিষি, ঠিক যেন সবুজাভ এক পেষ্ট। উষার পায়ের তালু সযত্নে মুছে নেই, একবিন্দু ধুলো যেন না থাকে। তারপর ক্ষতস্থানে পরম যত্নে সেই দুব্বার মলম লাগিয়ে দেই। চুপচাপ বসে আছে উষা, ঠিক যেন একটা পুতুল। ওর মুখটা আমার মুখের দিকে ঝুকে এসেছে, চুলের যে এমন সুন্দর গন্ধ আছে তা জানা ছিলো না। কী তেল মেখেছে উষা ?
কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করে, খুউব কাছে। লালমিয়া বলেছিলো- সে নাকি ময়ফলিরে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছে। উষাকেও আমার সেইরকম করতে ইচ্ছে করছিলো, প্রচন্ডভাবে ইচ্ছে করছিলো। অথচ ভয়ের একটা শীতল চোখ আমার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে। আমার অন্তরাত্মা সেই দৃষ্টির সামনে ভয়ে কুক্‌ড়ে উঠলো- 'সাবধান, উষা তোকে কতো ভালোবাসে। তুই কি তার চোখে লালমিয়ার মতো বাওটা বদমাশ বন্‌তে চাস্'?
না, আমি তা চাই না। আমি শুধু উষাকে পাঁশে নিয়ে অনন্তকাল ধরে হাটতে চাই।
খুব যত্ন করে উষাকে ধরে দাড় করিয়ে দেই।
বাহ্, এই তো আমার ওষুধের চমৎকার ফল ফলেছে। উশি দিব্বি পা ফেলে হাটতে পারছে এখন।

অবশেষে পাটকিলে ধরা খেয়েছে। মায়ের সাধের মোরগটা শিকার করতে যেয়ে তার পাপের ভারা পুর্ণ হয়েছিলো। চিতেশ্বরী থেকে মৈজুদ্দিন ভাইকে খবর দিয়ে আনা হলো। তিনি হাতে তৈরী বিরাট এক বংশনির্মিত ফাঁদ নিয়ে এসে হাজির। সে এমন দু'মুখো ফাঁদ যে শিয়াল তো শিয়াল বাঘ পর্য্যন্ত ঘায়েল হয়ে যায়। ফাঁদের দাতগুলি নীচ থেকে শিয়ালের ঠ্যাং আঁকড়ে ধরবে, সেই সাথে বেত দিয়ে আটকানো এক ধনুক সটাং করে এসে পিঠে প্রচন্ড জোড়ে বাড়ি মেরে তাকে কাবু করে ফেলবে। পাটকিলে প্রথম রাতেই ফাঁদে আটকা পড়ে হাকডাক শুরু করলো, আমরা লাফাতে লাফাতে এসে তাকে দড়িবন্দী করে ফেললাম। এইবার চাঁন, আরও মুরগী খাও। সকাল হোক, মজা দেখাবো।

লালমিয়ার সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়ায় কয়দিন যাবৎ মনে যে পাষানভার চেঁপে বসেছিলো, পাটকিলেকে ধরতে পেরে তা নিঃশেষে উঁবে গেলো। বলা যায় না, জ্যান্ত একটা শিয়াল দেখলে লালমিয়া আবার আমার কাছে ফিরেও আসতে পারে। সোজা কথা তো না, জলজ্যান্ত একটা শিয়াল।
সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতেই হোচট খেতে হলো। উঠানে বহুলোক জড়ো হয়েছে, সবাই শোকাহত। পাটকিলে আর নাই, তার বহুখ্যাত লেজটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। চোখ দু'টি বোঁজা। হায়, একটি জ্যান্ত শিয়ালের গলায় দড়ি বেঁধে ঘোরানোর প্ল্যনটা মাঠে মারা গেলো। মৈজুদ্দিন ভাই আফসোস করে বললেন- 'ছিলার টান বড়ো বেশী জোরে হয়ে গেছিল। বাড়ির চোটে মারা গেছে'।
ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নদীর পাড়ে গেলাম। কে না জানে যে তুরাগের বুকে ঝাপঝাপি করার মধ্য দিয়ে মনের সব দুঃখ সব অশান্তি নিঃশেষে ধুয়ে ফেলা যায়।
লালমিয়া, ধীরেন, সিরাজ সবাই বলাই (ডুবসাঁতার) খেলছে। আমাকে দেখে লালমিয়া মুখ ফিরিয়ে নিল। এখন আমি কী করবো, একা একা কি ডুব-সাতার খেলা যায় ?
গাঙের পাড়ে সবার প্যান্ট ও জামাকাপড় গাদাগাদি করে রাখা। তার পাশে ছোট্ট একটি নাদুশ-নুদুশ ছেলে টাব্বুশের মতো বসে আছে। অজিত, শশধর ঠাকুরের ছেলে, উশির ছোট ভাই। সে বেচারা এখনও সাতার শিখে নাই, সুতরাং পাড়ে বসে আর সকলের জলখেলা উপভোগ করছিলো।
আমি বললাম- 'অজিত,আয় তরে সাতার শিখাই। আমার গলা ধইরা পিঠের উপর শক্ত কইরা ঝুইলা থাক্, তরে ওপাড়ে নিয়া যামু'।
অজিত মহা খুশী হয়ে আমার কাছে চলে এলো, তাকে পিঠে নিয়ে সাতার খেলাটা মন্দ জমবে না বলে মনে হলো।
লালমিয়ার একটা কথা তীরের মতো আমার কানে এসে বিঁধলো- 'দ্যাখ্, সমুন্দীরে নিয়া সাতার কাটতাছে.....'।
রাগে অন্ধ হয়ে গেলাম আমি, লালমিয়ার নোংড়া কথাগুলি আমাকে পাগল করে ফেললো যেন। অজিতকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে লালমিয়ার উপর ঝাপিয়ে পড়ি। শুরু হয়ে যায় বাঘে-মহিষে লড়াই। কিল-চড়-ঘুষির মেয়াদ শেষ হলে কে কতোক্ষন কাকে পানির নীচে ঠেসে ধরে রাখতে পারে তার প্রতিযোগীতা শুরু হলো। সমবেত ছেলেরা হাততালি দিয়ে দু'জনের জলযুদ্ধ উপভোগ করছে। কতোক্ষন এই যুদ্ধ চলতো বলা যায় না, তবে অচিরেই ঘাটে স্নানরত মুরুব্বীদের কেউ কেউ শান্তির মিশন নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। আব্দুল বেপারী দু'জনকে ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন- 'ছিঃ ছিঃ, তরা না আপন মামাতো-ফুফাতো ভাই! এই রহম কুত্তার মতো কামড়াকামড়ি করতে তগো শরম করে না'?
ভালোবাসা বড়োই খারাপ জিনিষ, এর ছায়া দেখলেই লোকে কুৎসা কলংক রটায়। ছোটবেলায়ই তার হাতে-নাতে প্রমান পেয়েছি।

বাড়ীর কাছের ডোবাটা দলঘাসে এমনভাবে ছেয়ে আছে যে হাতমুখ ধোয়ার উপায় নাই। মা বললেন- 'গোসলের আগে আইজ ঘাটটা সাফ করিস তো। দলের লাইগা হাড়ি-পাতিল মাঞ্জন যায় না'।
দুই একটা দল টেনে তুলতেই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। ইয়া বড়ো বড়ো দুইটা কই মাছ দলের ছোবড়ার সাথে ওঠে এসেছে। এতই বড়ো যে গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। বিপুল উৎসাহে দল পরিস্কার করতে থাকি, পুরস্কারও হাতে হাতে মিলতে থাকে। শুধু কৈ মাছ না, দলের ছোবড়ার সাথে বড়ো বড়ো ইচা মাছও উঠে আসতে থাকে। অল্পক্ষনেই কৈ ও ইচা মাছে আমার খালুই ভরে এলো প্রায়।
লতিফা বুজির পোলা কাশেম এতোক্ষন নিবিষ্টমনে আমার এই অভিনব মৎস্য-শিকার পর্য্যবেক্ষন করছিলো। এবার সে বললো- 'কৈ মাছগুলা এত বড় হইছে কী খাইয়া রে'?
কাশেমদের বাড়ী ধামরাই শহরে। সে শহরের পোলা, সবসময় শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে।
আমি বললাম-'হেউলি মেউলি খায়, পাকা চুকা বাগুন খায়'।
বলা বাহুল্য আমাদের ডোবার পাড়ে চুকা বাগুনের মস্তো ঝাড় হয়েছে। গাছগুলিতে কাঁচা পাকা অসংখ্য চুকা বাগুন ধরে আছে। পাকা চুকা বাগুনগুলি গাছের নীচে ঝরে পড়ে, মাটিতে মিশে যায়। দু'চারটা গড়িয়ে ডোবার পানিতেও পড়ে। মানুষে না খেলেও মাছেরা চুকা বাগুন খায় বলে আমার ধারণা।

আমার অজ্ঞতায় কাশেম বিজ্ঞের মতো হাসে। বলে–‘দুর বোকা। চুকা বাগুন কিরে, এইগুলির ভালো নাম টমাটো। শহরের সবাই টমাটো দিয়া শালুন রাইন্ধা খায়’।
কাশেমের কথায় অবাক হই আমি, বন্ধু হবির কথা মনে পড়ে– ‘কলিকাল আইসা গেছে। অখন ঘাট অঘাট হইব, ধনী গরীব হইব, অখাদ্য খাদ্য হইব। কিয়ামতের আর দেরী নাই’।
চুকা বাগুনও যুদি মাইন্ষে খাওয়া শুরু করে তাইলে কিয়ামতের আর বাকী থাকলো কি ?
এমন সময় দেখি শায়লা গুটি গুটি পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। শায়লা লালমিয়ার ছোট বোন, স্কুলে আমার দুই ক্লাশ নীচে পড়ে। সে বললো– ‘নাইলা ভাই তোমারে যাইবার কইছে’।
সেদিনের ঝগড়ার পর লালমিয়ার সাথে মিটমাটের সুযোগ পাই নাই। সবকিছু ভুলে গিয়ে আবার ওর সাথে মিলে যেতে প্রচন্ড ইচ্ছে হয়, ওর নিষিদ্ধ আকর্ষণ আমাকে প্রচন্ডভাবে টানে। অভিমানের বশে একয়দিন মিটমাটের চেষ্টা করি নাই। শায়লা যখন লালমিয়ার আমন্ত্রনের কথা জানালো, তখনও আমার অভিমান দুষ্ট ঘোড়ার মতো ঘাঁড় বাকিয়ে থাকলো। বললাম– ‘ক্যান্, আমি যামু ক্যান্ ? হে আইবার পারে না...’?
–‘এল্লা, তুমি জান না, নাইলা ভাই’র আইজ সাত দিন ধইরা খুব জ্বর। ডাক্তারে কইছে নাইলা ভাইর টাইফড অইছে’।
এইবার আমার অভিমানের পাড়ে ফাটল ধরে। আমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু রোগশয্যায়, আর আমি কিনা বসে বসে অভিমানের কাটাগাছে জল দিচ্ছি। ধিক আমাকে!
হাতের কাজ ফেলে রেখেই ছুটলাম লালমিয়াকে দেখতে। ছোট মামা বৈঠকখানায় বসে তামাক টানছিলেন। আমাকে দেখে গলা খাকারি দিয়ে বললেন– ‘কেডা, ম্যাজের নি ? আয়, কাছে আয়’।
আমি কাচুমাচু মুখে তার সামনে যেয়ে দাড়ালাম। তিনি আদর করে মাথায় হাত রেখে বললেন– ‘এ কয়দিন তরে দেখি নাই ক্যান্, মারামারি করছিলি তাই’?
আমি বললাম– ‘মামু, লালমিয়ার নাকি জ্বর’?
তিনি বললেন– ‘হ বাবা, ডাক্তার কইল নাকি টাইফয়েড অইছে। যাও, তোমারে দেক্পার লাইগা ছটফট করতেছে’।
আস্তে আস্তে রোগশয্যার পাশে যেয়ে দাড়াই। লালমিয়াকে দেখে ভীষন অবাক হয়ে যাই আমি, মাত্র সাত দিনে এ কী চেহারা হয়েছে লালমিয়ার ! একটি জীবন্ত কংকাল যেন, চোখ দু’টি জ্বলজ্বল করছে কেবল। ঘরময় একটা বোট্কা দুর্গন্ধ। আমি আস্তে আস্তে তার মাথার কাছে যেয়ে দাড়াই, আমার হাত দু’টি জড়িয়ে ধরে লালমিয়া। জড়িয়ে ধরে নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। আমার মুখেও কোন কথা নাই।
কিছুক্ষন পরে লালমিয়া বললো– ‘ক্যাইন্শা, আমারে একটা বিড়ি দিবার পারবি’?
ওর কথা শুনে অবাক হয়ে যাই আমি। বিড়ি আমি কোথায় পাব, বিড়ি কিনে খাওয়ার মতো অবস্থা আমার না।
লালমিয়া বললো– ‘বাবায় আমার বান্ডিলডা ফেইলা দিছে। দুই দিন ধইরা একটা টান দিবার পারতেছিনা, আমার জান বাইরাইয়া যাইতেছে। তর কাছে না থাকে এই পয়সাডা নে। তোতার দোকান থেইকা চাইরডা বিড়ি কিনা দে আমারে। খুব সাবধান, কেউ জানি টের না পায়’।
আমি ইতস্তত করে বললাম– ‘জ্বরের মুখে বিড়ি খাবি, যুদি ক্ষতি অয়’?
লালমিয়া বললো– ‘ক্ষতি অইব না, দুই একটা টান দিয়াই ফেইলা দিমু। আমার তো আর যক্ষা অয় নাই, জ্বর অইছে। জ্বরের মধ্যে হগ্গলেই বিড়ি তামুক খায়’।
কী আর করা, পয়সা হাতে নিয়া দরজার দিকে এগুই। লালমিয়া আবার পেছন হতে ডাকে– ‘ক্যাইন্শা, আরেকটা কথা হুন’।
‘কী’? আমি আবার তার পাশে যেয়ে দাড়াই।
আমার হাত দু’টি ধরে কিছুক্ষন চুপ করে থাকে লালমিয়া। বলে– ‘ছোটবেলায় মা মইরা গেছে, আমারে হগ্গলে পাগল কয়। আমার মাথায় আসলেই মনে অয় গোলমাল আছে। তর লগে হুদাহুদি মারামারি করছি। আমারে মাপ কইরা দিস্ ভাই, আর কুনদিন এমুন করুম না’।
লালমিয়ার নরম কথায় মনটা আবেগে মন্থিত হয়ে উঠে। মুখের ভাষা হারিয়ে গেছে। সে বলতে থাকে– ‘ময়ফলির বিয়া অইয়া যাওনের পর আমার কিছুই ভাল লাগে না, সবকিছু ভাইংগা চুইরা ফেলতে ইচ্ছা করে। তর লগে উষার মাখামাখি দেইখা খুব রাগ অইছিলো। যাউকগা, কিছু মনে রাখিস

না। উষা মাইয়াডা খুব ভালো, জ্বর সারলে একদিন অর কাছে যাইয়া মাপ চাইয়া আহুম। আমারে কথা দে, বড় অইয়া তুই উষারে বিয়া করবি'।
লালমিয়ার 'মাথা-খারাইপা' কথা শুনে আমি থ', এক্কেবারেই থ'।

আমরা সাধারনত শ্লেট পেন্সিলে লিখি। কাগজ অত্যন্ত মহার্ঘ্য বস্তু হওয়ায় স্কুলে হাতের লেখা নিতে তালপাতা-কলাপাতাই আমাদের প্রধান বাহন। বাঁশের কঞ্চিকে চোখা করে কলম তৈরী করা হয়, সেই কলমের লেখা তালপাতার উপর মন্দ ফুটে না। আর কয়দিন পরই হাইস্কুলে পড়তে যাব, তখন শুধুই খাতা, শ্লেট-পেন্সিলের কোন কারবারই নাই। সেই সোনালী দিনের আশায় পথ চেয়ে আছি, এমন সময় একদিন এক আজব কান্ড ঘটলো।
উশি তার ঝোলা থেকে একটি ঝকঝকে কলম বের করে বললো- 'ইডা পাইলট পেন, দাদায় আমার জন্য কইলকাতা থেইকা কিনা আনছে'।
প্রাইমারী ইস্কুলে ফাউন্টেন পেন, তাও আবার পাইলট !
সাগ্রহে কলমটি হাতে নেই আমি। চমৎকার জিনিষ, ক্যাপটা কি সোনার তৈরী ? খুবই দামী জিনিষ, কম সে কম এক টাকা তো হবেই। কাগজের উপর টান দিলাম। কি সুন্দর চলে, একেবারে রেলগাড়ীর মতোন। এরকম একটা কলম থাকলে দিনরাত লিখেও ক্লান্তি লাগে না।
বললাম- 'খুব ভাল জিনিষ রে উশি। তুই যুদি এই কলম দিয়া পরীক্ষার খাতায় লেখস্ , নির্ঘাৎ ফার্ষ্ট-টার্ষ্ট হইয়া যাবি'।
উষা বললো- 'আমার অতো ফার্ষ্ট হওয়ার শখ নাই। কলমডা আমি তরে দিলাম। এইডা দিয়া বিত্তি পরীক্ষা দিবি, বিত্তি পাওন চাই,.. বুঝলি'?
সর্বনাশ ! পাগলে কয় কী ? কলমটা আমারে একেবারে দিয়া দিলো ! পৃথিবীতে এমন আজব কথা কে কবে শুনেছে?
আমার হতভম্ব ভাব দেখে উশি বললো- 'অমন হাবার মতো চাইয়া আছস্ ক্যান্, কলমডা আমি সত্যই তরে দিলাম। দাদায় যেদিন কলমডা আমারে দিছে, সেইদিনই ঠিক করছি কলমডা তরে দিমু, তুই বিত্তি পরীক্ষা দিবি'।

জীবনে এভাবেই সব অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। যা পাওয়ার নয় অযাচিতভাবে মিলে যায়, আর যা সবার আগে পাওয়ার কথা তা কোথায় মরিচিকার মতো মিলিয়ে যায়। সেদিন পঞ্চম শ্রেনীর দীনদরিদ্র বালকের কাছে একটি সোনালী রংয়ের কলম উপহার পাওয়া ছিলো পরম পাওয়া, এ খুশীর পরিমাপ দেশ-কালের অতীত। আলাদিন আশ্চর্য্য প্রদীপটি পাওয়ার পর যেরূপ খুশী হয়েছিলেন, আমার খুশী তার চেয়ে কম ছিলো না। একটা কারনে মনটা খুতখুত করছিলো। ফাউন্টেন পেন ঝোলার ভেতর ভরে রাখার কোন জিনিষ নয়, বুক পকেটে ঝুলিয়ে রাখার জিনিষ। কিন্তু আমার জামার বুক পকেটটি বহু পুর্বেই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সাইড পকেটগুলি কোনমতে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে বটে, তবে সেগুলিতেও অগণিত ছিদ্রপথ। একটা ফাউন্টেন পেন পেয়েও যদি তা বুকে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো না যায় তবে সে পাওয়ার মুল্য কী ?
দুপুরে খাওয়ার সময় মাকে বললাম- 'মা, বাবারে কইয়া আমারে একটা নুতন পিরণ কিনা দিবা। এই দ্যাখ আমার পিরণডা ছিড়া তেনা তেনা অইয়া গেছে গা'।
আমার কথায় মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন- 'কী কইলি ! পয়সা কি গাছের গুটা যে মাসে মাসে তোমারে পিরণ কিনা দিতে অইবো'।
আমি গো ধরে বললাম- 'ক্যান্, দিবা না ক্যান্ ? কাশেমের কতগুলা পিরণ, লালমিয়ার কতগুলা পিরণ ? খালি আমারই মোটে একটা পিরণ থাকবো, না'?
আমার কথায় মা আরও রেগে যান। বলেন- 'ঈশ্, কার লগে কার তুলনা ? কাশেম-লালমিয়াগো বাপের জমিদারী আছে, তর বাপের কয়ডা জমিদারী আছে হুনি ? হুঃ, চইত্ মাস আইতে না আইতেই ধানের মণ সাত টেকা অইয়া গেছে। এক মাস পরে ধান কিনার কোন্ জো অইবো হে চিন্তায় চান্দি গরম অইয়া থাকে, উনি আছেন বাবুগিরির তালে। নে, খাইলে খা নইলে দুর হ। কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করবি না'।

ধান-চাউলের খোটা বড়ো মারাত্মক, বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে, মানুষের সব প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ করে দেয়। না খেয়ে থাকা যতো না বেশী কষ্টের, তার চেয়ে বেশী লজ্জার ও গ্লানির। চাউল না থাকাতে ও বাড়ীতে আজ চুলা জ্বলে নাই --এই সংবাদটা মানুষের সমস্ত সৎসাহস ভেংগে চুরমার করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। সুতরাং মাথা নীচু করে অন্ন কয়টি গলাধঃকরণ করে মানে মানে কেটে পড়তে হয় আমাকে।

লোকমান ও গফুর লাঠি খেলায় মস্তো উস্তাদ হয়ে উঠেছে। বিকেলে তারা বীর হানিফা ও এজিদের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে। 'তবে রে কাফের, ধর্ অস্ত্র কর্ রণ্'- বলে হানিফা এজিদরূপী গফুরের উপর ঝাপিয়ে পড়লো। ফটাফট লাঠির শব্দে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। এমন সময় লালমিয়াদের বাড়ী থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে, বেংলাবেংলী কান্না। বিষয় কি, লালমিয়ার কিছু হলো নাকি ? খেলাধুলো ফেলে তক্ষুনি দৌড় দেই সেদিকে। হট্ট-কান্নার মাঝে শায়লার কান্নাটা বড়ো বেশী বাজে আমার কানে- 'অ বাবা বাবগো, নাইলা ভাই আর নাই গো'।

ভীড় গলে কোনমতে আমার অতি পরিচিত সেই ঘরে এসে দাড়াই। আমার বন্ধু লালমিয়ার ছোট্ট দেহটা মাটির উপর লম্বালম্বিভাবে শোয়ানো, একটি মলিন চাদরে সর্বাংগ ঢাকা। লালমিয়া মারা গেছে, আর কোনদিন আমাকে বলবে না---'নো ক্যাইন্শা, বাইচ খেলা দেইখা আহি'। কালিয়াকৈরের হাটের দিন জনারণ্যে আর কোনদিন হাত ধরাধরি করে হাটবে না, আর কোনদিন প্যান্টের পকেট হতে চকচকে সিকি বার করে বলবে না -'এ্যাই দ্যাখ্, বাবার কাছ থেইকা আনছি। কী খাবি, বরফি না কদ্মা'?

একটা অসহ্য কষ্টে কাতর হয়ে পড়ি আমি। নিজকে ভীষন একা মনে হয়। সবার অলক্ষ্যে একেবারে বেড়ার কোল ঘেষে যেয়ে দাড়াই। চৌকির উপর লালমিয়ার জামা-লুংগি-প্যান্ট সব পড়ে আছে। চৌকির নীচে একজোড়া খড়ম। মাথার কাছের তোষকটা একটু উল্টে আছে, তার নীচে রুমালে বেঁধে কী যেন একটা রেখেছিলো লালমিয়া। সাবধানে পুটলিটা খুলে ফেলি। একটা আধুলি ও গোটাকয়েক তামার পয়সা ছাড়া আর কী আছে ওতে ?

গাদিলা পাতার তৈরী কুৎসিৎ চেহারার হলুদরঙা কয়েকটা শলাকা। তোতার দোকান থেকে আমিই সেদিন গোপনে লালমিয়াকে কিনে এনে দিয়েছিলাম। এগুলি কি লালমিয়ার মৃত্যুবাণ ছিলো ?

নিজেকে বড়ো ছোট মনে হয় আমার। জিনিষগুলিকে মুঠোর ভেতর চাপটে ধরি। সবার অজান্তে এগুলিকে তুরাগের বুকে বিসর্জন দিতে হবে আমাকে।

মেজবাহউদ্দিন জওহের

মে-২০০৫